লকডাউনের স্বাস্থ্য : চেনা কাজের অচেনা মেয়েরা

বর্ণালী পাইন

মার্চের ২২,২০২০. ভারতের প্রধানমন্ত্রী জনতা কারফিউ ঘোষণা করলেন।

'গৃহবিতান' বাড়ির ২০টি ফ্ল্যাটের রমা, ইরা, দীপা, শোভা, সীমা, বেণু, পুতুল, নমিতারা ২১এর বেলাবেলি বাড়ি ফেরার সময় একে অপরকে কলকলিয়ে বলে গেল, কাল ছুটি আবার পরশু আসবে। ২০টি ফ্ল্যাটে ছোট ছোট মধ্য ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের বাস। প্রতিটি ফ্ল্যাটে নানা কাজের মেয়েদের নিত্য আনাগোনা। এখন তো কেউ সাবেকি অভ্যাসে ঝি বলে না। বলে কাজের মেয়ে। গৃহ পরিচারিকা সংবাদপত্রের ভাষা, দৈনন্দিনের নয়।

২২এর রাতে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে Residents' Welfare Association থেকে সব ফ্ল্যাটে রাতারাতি করোনা বিধির নোটিস এসে গেল।

২৩ এর সকালে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে বেল বাজল। সেগুন বা ডিজাইনার দরজা থেকে একটু উঁকি দিয়ে "ক'দিন আর এসো না কাজে" বলা হল রমা, ইরা, শোভাদের। ২৪ থেকে যে লকডাউন।

সাতদিন এমন বেমক্কা ছুটি পাওয়াটা প্রায় লটারি লেগে যাওয়ার মতো। উফ কোনও কালে কাজের বাড়িতে এমন ছুটি মেলেনি মেয়েগুলোর। তারা কোথাও দূরে বেড়াতে গেলে তবেই ক'দিন লম্বা ছুটি পেয়েছে ওরা। তাও তারা ফিরলে সাত দিন ধরে রাশি রাশি কাচাকুচি করেছে শুধু। আর নইলে টানা ছুটি মানে তো দীপার সেবার পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে যাওয়া, রমার ছেলের বাড়াবাড়ি ডেঙ্গু বা দেশের বাড়িতে নমিতার বাবাকে কুঁড়ের দাওয়ায় শিয়াল কামড়ে দেয়া। সে তো ভয়ানক সব বিপদের দিন। আগু পিছু ভাবনার জো ছিল না । সে তো শুধু লড়াই আর লড়াই।

এক চিলতে ঘরে দুটো ছেলে সামলে ভাঙা হাতকে জুড়ে তোলা ।

আই ডি হাসপাতালে ছেলের জন্য দিন কাটানো, রাত কাটানো, মাঝে এসে সংসারের কাজ, বুড়ি শাশুড়িকে খেতে দেয়া, ছোট মেয়েটাকে চান করানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, পড়ে থাকা বাসন মাজা, কাপড় কাচা, দোর পরিষ্কার করা।

Society Language and Culture

আর শেয়ালে খুবলনো বাবার জন্য তো টানা দেড় মাস কলকাতায় ফিরতেই পারেনি নমিতা। শেষ পর্যন্ত বাবা বাঁচল না। ফিরে আসার পর দুটো তিন বছরের পুরনো কাজ চলে গিয়েছিল ওর।

তাই এমনি করে মুফতে এত গুলো ছুটি পেয়ে মনটা খুশিতে ভরে গিয়েছিল ওদের। কিন্তু ওই যে কী করোনা না কী হয়েছে, তার জন্য ট্রেন, বাস বন্ধ, সে জন্যই লকডাউন -- গোটা ব্যাপারটা বোধগম্য হচ্ছিল না ওদের কারোরই। কিন্তু ছুটি বলে ছুটি ! ২২ এর পর থেকে টানা। কেউ বলল, একেবারে মাস পয়লা আসিস, কেউ বলল ফোনে বলে দেবে,হয়তো তার আগেই আসতে হবে। তাই ওরা একটু পা ছড়ানোর সুযোগ পেল নির্ভাবনায়। ২৪ থেকে ৩১ মার্চ।

সব স্কুলের মতো ওদের বাচ্চাদের স্কুলও বন্ধ হয়ে গেল। শোভার মেয়েটা বড়। দুটো অনার্স পরীক্ষা পার হয়েছে ভালো ভাবে। এবারে পার্ট থ্রি দিলেই শান্তি।সে ঘরেই পড়ে পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল। এবার ছোট বোন দুটোরও স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। একটা ঘরে কোনও রকমে থাকা। সারাক্ষণ নানা শব্দ, নানা কথা। মেয়ের পড়া আর এগোতে পারে না।

টিভিতে বলছে, লোকাল পার্টি অফিস থেকে মাইকে ঘোষণা করতে করতে যাচ্ছে কুড়ি সেকেন্ড ধরে ঘষে ঘষে হাত ধুতে হবে। সাবান তো তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যাবে অত ঘষলে। তবে কি আর চারটে সাবান বেশি আনতে হবে এবার !

মুখে কেউ রুমাল বাঁধল, কেউ কুড়ি বা তিরিশ টাকায় মাস্ক কিনে আনল। একটা মাস্ক নাকি দুজনের পরা চলবে না ! এত বাড়তি খরচের টাকা জুটবে কী করে। স্বামী স্ত্রীরা কেউ মাথায় হাত দিল, কেউ নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি করল। কাছে পিঠে আর ক'জনই বা কাজ করে। অনেক মেয়ের যাতায়াত রেলপথে। তাদের আসা যাওয়ার সব পথ বন্ধ হয়ে গেল।

ট্রেন বন্ধ হয়ে যেতে কাজে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হল স্বামীদেরও। কারখানা বন্ধ হল। ইলেকট্রিক বা কলের কাজে ঘরে আর ডাক পাচ্ছিল না কেউ। মালিক work from home করছেন বলে যারা ড্রাইভার, তাদের কাজগুলোও বন্ধ। work from home -- ইংরেজি কথা বটে। এটা ইংরেজিতে বলতে লাগে। বেশ একটা শ্লাঘা আছে কথাটায়। পরের বাড়িতে যার কর্মস্থান তার বেলা ? তাদের তো সবটাই সরু সুতোয় ঝুলন্ত।

মাস কাবার হতে মাইনে নিতে এল কাছাকাছি থাকা রমা, ইরা, শোভারা। তাদের কাউকে লিফট ব্যবহার করতে দেয়া হল না। মার্চ মাসের মাইনে পেল। ওপর থেকে ব্যাগ ঝুলিয়ে

Society Language and Culture

আলগোছে কাগজে মোড়া টাকা পৌঁছল হাতে। কিন্তু কাজে ঢোকার ডাক এল না। " পরের মাসে এসে টাকাটা নিয়ে যেও", হাসিমুখে বলেছিলেন শুধু ইরার বৌদি। আর মাইনের টাকার সাথে প্যাকেট ভরে দিয়েছিলেন সাবান, স্যানিটাইজার, পুরু মাস্ক আর মাল্টি ভিটামিন ট্যাবলেট। এসব তো দূর, পরের মাসে মাইনে নিতে আসার তেমন কোনও আশ্বাস বাকিরা পায়নি। খানিকটা অনিশ্চয়তা, খানিকটা ভয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেল কাজের মেয়েরা।

না, এখানে কোনও ফ্ল্যাটবাড়িকে কেন্দ্র করে লকডাউনের গল্প করতে বসিনি। আমার ভাবনা, আরও প্রাঞ্জল করে বললে দুর্ভাবনা আমাদের লিঙ্গ ও শ্রেণীভিত্তিক প্রাত্যহিকের নিগূঢ় অসুস্থতা নিয়ে।

বারবার শোনা কথাগুলো শুনতে, বলতে নাকি ভালো লাগে না। আমি বিশ্বাস করি, কথা হবে হাতুড়ির মতো। আঘাতের পর আঘাত হানাই তার কাজ, একই রকম আঘাত। উদ্দেশ্য পূরণ না হলে হাতুড়ি হানবেই তার আঘাত। জোরে, জোরে, আরও জোরে।

রুটি রুজি বন্ধ করে ঘরে থাকা, কলকারখানা বন্ধ বলে বা অকালে ছাঁটাই হয়ে বাড়িতে থাকা, work from home করা -- এ সবই বুঝি এক ?

কেউ বলেনি এক। কেউ বলেনি আলাদা। শুধু ঘরে থাকতে বলা হয়েছে। ঘরের কাজের মেয়েদের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে প্রথম থেকে তাদের করোনার সম্ভাব্য বাহক মনে করা হল। অথচ কলকাতার মানুষ করোনা নিয়ে প্রথম নড়ে চড়ে বসেছিল সরকারি আমলার অক্সফোর্ড ফেরত করোনা পজিটিভ ছেলে কোয়ারনটাইনে না গিয়ে নবান্ন থেকে বেরিয়ে সামাজিক আদান প্রদানের নানা জায়গায় বিনা বাধায় ঘুরে বেড়ালো বলে। কী আশ্চর্য ব্যবহার আমাদের। আইনের রক্ষকরা একটি ছেলের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। আন্তর্জাতিক উড়ান বেশ কিছুদিন টানা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে পারলে আজ এত বাড়াবাড়ি দেখতে হত কি? অথচ রোগাতংকের কারণ হল অতি নিম্নবিত্ত কিছু বউ, মেয়ে যারা বাড়ির পুরুষের নানা শাসন, তর্জন সত্ত্বেও ঘরের সমস্ত কাজ সেরে আরও পাঁচ ফ্ল্যাটে এঁটো বাসন মেজে, ময়লা কাপড় কেচে, ঘর ঝাঁট দিয়ে, মুছে, পাঁচ পদ রান্না করে সংসার সামলায়, ছেলে মেয়েকে পড়ায়। অনেকেই বলেছে, বরের উপার্জনে দু'বেলা দু'মুঠো খাবার হয়তো জুটবে যদি বরের নেশার খরচ লাগামছাড়া না হয়। কিন্তু বরের একার রোজগারে ছেলে মেয়েকে পড়ানোর সাধ কিছুতেই মিটবে না তাদের। ঘরে ও বাইরে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে উপার্জন করতেই হয় তাই সন্তানের মায়েদের। অক্ষম মা বাবার খাওয়া পরা, ছোট ভাই বোনদের লেখা পড়ার দায়িত্ব নেয়

Society Language and Culture

গরিব বাড়ির অবিবাহিত মেয়েরাও। কাজের বাড়িতে কাজে যাওয়ার পেশাটা পুরনো, লিঙ্গ ভিত্তিক।

একসময় সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়িতেও পুরাতন ভৃত্য সংস্কৃতি স্বাভাবিক ছিল। একান্নবর্তী পরিবারে অপরিহার্য কর্মক্ষম পুরুষ ভৃত্য । এই গৃহশ্রমিকরা অনেকেই আসত বিহার, উড়িষ্যা বা মেদিনীপুর থেকে। তারা দেশে গেলে সংসারের মা, বউদের পরিশ্রম বেড়ে যেত অনেক গুণ। একান্নবর্তী পরিবারের চল যত উঠে যেতে লাগল, ছোট পরিবারে পুরুষ ভৃত্যের চাহিদা একেবারেই উঠে গেল। একান্নবর্তী পরিবারে ঝি ছিল শুধু ঠিকে কাজের জন্য। তাদের নিজস্ব নামের বদলে অমুকের মা বলে ডাকার খুব চল ছিল। অতি দরিদ্র মেয়ে সারাদিন পরিশ্রমের বদলে যৎসামান্য টাকা রোজগার করত। তার নামটা পর্যন্ত জানতে চাইত না কেউ। নামটা প্রকাশে মেয়েরা সে যুগে লজ্জাও পেত। গোটা জীবন এমনভাবে নামহীন কেটে যেত তাদের।

সংসার যখন ক্রমশ ছোট হয়েছে স্কোয়ার ফিটের মাপে, কাজের মেয়েদের কাজের সুযোগও বেড়ে গেছে। কিন্তু তাদের কাজ তো অন্য বাড়িতে। সেই বাড়িতে ঢুকতে না পেলে কর্মহীন, উপার্জনহীন হয়ে পড়ে তারা। ওদিকে বাড়ির মহিলাদের দুর্ভোগের শেষ থাকে না। কাজের মেয়ে না থাকলে তাদের জন্য বরাদ্দ গোটা কাজটাই প্রায় এসে পড়ে বাড়ির মেয়েদের ওপর। যেসব পরিবারে work from home এর পরেও পুরুষটি ঘরের কাজে হাত লাগিয়েছে সেটাও কিন্তু একশো শতাংশ প্রতিদিনের জন্য নয়। পুরুষের ঝাঁট দেয়া, বাসন মাজা নিয়ে meme ছড়িয়ে পড়েছে নেটিজেনদের মধ্যে। সিনেমা বা সিরিয়ালের জগতে জন্মেই তারা হয়ে ওঠা অভিনেতা অভিনেত্রীদের গৃহকর্মের ব্যস্ততা দেখিয়ে টিআরপি বাড়াবার চেষ্টা করছে টিভি চ্যানেলগুলো। এইসব মস্করার মূলে সামন্ততান্ত্রিক পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লালিত পুরুষ ও নারী এবং শ্রেণী আধিপত্যবাদের বিষয়টি মজ্জাগত।

আমাদের সমাজের গাঁথনিটাই ভিন্নতার ওপর দাঁড়িয়ে। যেখানে গোটা দুনিয়া করোনা ঝড়ে আর্থিকভাবে ধসে পড়ছে, রেকর্ড আর্থিক মন্দার সঙ্গে লড়াই শুরু হয়ে গেছে, সেখানে ঘরের কাজের মেয়েরা কাজের বাড়িতে অর্থাৎ তার কর্মক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার না পেলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের একটি বিপুল অংশ মুখ থুবড়ে পড়ে।

প্রথম দুইমাস যারা বিনা কাজেও বেতন তুলে দিলেন কাজের মেয়ের হাতে, তারাই কিন্তু তৃতীয় মাস থেকে এই বেতনকে বাড়তি খরচ মনে করলেন। ব্যতিক্রম অবশ্যই

Society Language and Culture

আছে। কিন্তু সেই ব্যতিক্রম শুধু অন্যতাকেই স্পষ্ট করে, প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবহারকে নয়। এই বাড়তি খরচ মনে করাকে খুব হীন চোখে বিচার করছি না। নিয়োগকারী বেশ কিছু পরিবারে মাইনে থেকে নির্দিষ্ট অংশ লকডাউনের কারণে কেটে নেয়া হয়েছে, কেউ কেউ বেসরকারি অফিসের উঁচু বা মাঝারি পদ থেকে ছাঁটাই পর্যন্ত হয়েছেন। তাই নিজের পরিবারকে স্বচ্ছন্দে রাখাটাই অনেক মধ্যবিত্ত সংসারে একটা বড় পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তবু সবটুকু মাইনে কেটে নিলে বা একদম কাজ থেকে বরখাস্ত করে দিলে স্বল্প আয়ের ঘরের কাজের মেয়েরা কোথায় দাঁড়াবে, তা কি আমাদের ভাবার নয় ? এটা কিন্তু দয়া মায়ার বিষয় নয়, যার শ্রম কিনে বাঁচি, নিজের ঘরের কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নিই অল্প টাকার বিনিময়ে, বদলে পাই নিজের মতো করে সময় সদ্ব্যবহারের অবকাশ, কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে তার শ্রম গ্রহণে শঙ্কিত বোধ করছি বলে তাকে আর্থিক ভাবে বঞ্চিত করা অনৈতিক শুধু না হয়ে বেআইনি হলেই ভাল হত। কারণ, ঘরের কাজের মেয়েদের মাসিক বেতন হিসেবে যা দেয়া হয়, তা বাজারদরের প্রেক্ষিতে যথেষ্ট কম। শ্রম এখানে সস্তায় কেনা যায়, আর অসংগঠিত ক্ষেত্রের এই মেয়েদের কোনও অধিকার বিধি আজও নির্দিষ্ট নয়। তারা আজকের দিনেও অধিকাংশ নিরক্ষর, অথচ সন্তানের পড়াশোনা তাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। লকডাউনের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত অনলাইন ক্লাস নিতে শুরু করেছে। সে ক্ষেত্রে স্মার্ট ফোন ও তার বর্ধিত ব্যয়ভার তারা বহন করবে কী করে ?! সঙ্গে প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা তো ঘরে ঘরে। সেটাও এখন অনলাইন। আমরা যখন কাউকে নিজের স্বার্থে অর্থের বদলে অন্দরে প্রবেশাধিকার দিই , তাকে শুধুমাত্র মাস মাইনে দিয়েই দায়িত্ব শেষ হতে পারে না। পুরো বিষয়টা একটা প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হওয়াই সভ্যতা। অথচ উল্টো দিকে নিয়োগকারী পরিবার যখন দেখে বেশি মাইনে বা সুযোগ সুবিধের আশায় তার কাজের মেয়েটি অন্য কোথাও কাজ নিল, তখন তাকে অকৃতজ্ঞ বলতে আটকায় না তাদের। অথচ নিজের প্রিয়জন যখন একটা চাকরি ছেড়ে আরেকটা নেয়, তখন সগর্বে " ও বেটার অফার পেয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে" বলাটাই অতি পরিচিত শিক্ষিত লোকজনের সামাজিক অভ্যাস।

কোনও নির্দিষ্ট নিয়মবিধির আওতায় না থাকার ফলে ঘরের কাজের মেয়েদের ভাগ্য দাঁড়িয়ে থাকে নিয়োগকারীর ব্যক্তিগত ইচ্ছের ওপর। ইরার বউদিকে নিয়ে আশ পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা হাসাহাসি করে দলবদ্ধ হয়ে। তিনি নাকি নাম কেনার জন্য ইরাকে এত কিছু দিয়ে চলেন।

Society Language and Culture

Residents' Welfare Association হাজার হাজার। একেকজনের একেক রকম নিয়ম। এই Associationগুলোকে একজায়গায় আসতে বাধ্য করা যায় না কেন ?

লকডাউনে বহু মানুষের একঘেঁয়েমির শেষ নেই। তারা এত অবসর নিয়ে কী করবে ভেবে না পেয়ে ফেসবুকে বেড়ানোর, রান্নার, ফুলের, সাজগোজের ছবি পোস্ট করছে, কেউ মেতেছে ছবি আঁকা, আবৃত্তি, গান, বাজনা নিয়ে। টিভিতে দেখাচ্ছে তারকাদের অন্দরমহল। আর বাড়িতে থেকে জীবন নরক হয়ে উঠছে ঘরের কাজের মেয়েদের। সকলে বাড়িতে থাকলে স্থান সংকুলান হয় না। স্বামী বাড়িতে থাকলে প্রায়ই বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকে নানা ছুতোয়। বাচ্চারা বেরোতে না পেরে হৈ চৈ লাগিয়ে দেয়। ক্ষিদের জ্বালাও বেড়ে ওঠে তুঙ্গে। রোজগার নেই অথচ খরচ আছে। কী ভাবে কী করবে তা নির্ণয় করার দায় থাকে না নিয়ামকদের। চাল, ডাল, বিস্কুটের ত্রাণ তো ওরা চায়নি। ওরা খাটতে জানে। খেটেই চালাতে চায় সংসার। ভাইরাস বাধা হয়ে গেল আজ, কিন্তু ক্ষিদের জ্বালা তো বড় হল না কোনো কালে। প্রতিদিন এই দেশে ক্ষিদের জ্বালায় কত মানুষের মৃত্যু হয় তার হিসেব কাগজে কলমে থাকলেও সেই নিয়ে মাথাব্যথা দেখি না প্রশাসনের কাজকর্মে।

অত্যন্ত একপেশে লোক দেখানো সংসার দেখেছেন ? যে সংসারে রোজগারের উৎস খোঁজা নেই, সঞ্চয় ভাবনা নেই, হামেশাই অতিরিক্ত বাজেখরচ আছে, ডিগ্রি থাকলেও শিক্ষার সমূহ অভাব, সংসারের মাথায় যারা, তাদের নানা বিলাসিতা, স্বজন পোষণ স্পষ্ট, অনুগত ভৃত্যদের ওপর শোষণতন্ত্র ধারাবাহিক, যে সংসারে বড়লোক অতিথি এলে ঢেকে দেয়া হয় ভৃত্যদের ছেঁড়া পোশাক, ঢেকে দেয়া হয় মলিন চাদর, অভুক্ত বা অর্ধ ভুক্ত ছোটদের বঞ্চিত করে থালায় বিপুল খাদ্য পরিবেশন করে অতিথি আপ্যায়ন হয় --- সেই সংসার মানবতার লজ্জা। সেই সংসারটাই আমার দেশ। এখানে উপার্জনের উৎস তৈরিতে পরিকল্পনার সার্বিক অভাব, ক্যামেরার সামনে দলের ছাপ মেরে ত্রাণ বিলি এখানকার কর্ম সংস্কৃতি। তাই সাবেকি ঝি, থুড়ি কাজের মেয়েদের সম্মান বাঁচিয়ে তাদের জন্য কোনও সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরি করা আজও চিন্তার অতীত হয়েই রইল।

লকডাউন ও আনলকড সময়ের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পর্ব-পরবর্তী সময়ে আবার ঘন ঘন লকডাউন, নিত্য নতুন ঘোষণায় অভ্যস্ত নিউ নরমালে কাজে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে অনেক কাজের মেয়েদের। কতদিন আর এইভাবে "কাজের লোকের কাজ " নিজেরা সামলানো যায় ! যারা ডাক পেয়ে কাজে যোগ দিতে পেরেছে, তাদের হাল ফিরেছে কিছুটা। ধার শুধতেই বেগ

Society Language and Culture

পেতে হচ্ছে খুব। বাকি কয়েকজন ফুটপাথে বসার চেষ্টা চালিয়ে পাড়ার সর্দারদের পকেটে সাধ্যমতো কিছু গুঁজে কেউ পেঁয়াজ, কেউ পুজোর ফুল, কেউ ডিম নিয়ে বসেছে। কোনও রকমে প্রাণে বাঁচার তাগিদে। রেশন কুপন বিলি নিয়ে এর মধ্যে ধুন্ধুমার কাণ্ড হয়ে গেছে নানা এলাকায়। মাথা ফাটিয়ে বাড়ি ফিরেছে নানাজন। সেখানে নাকি পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মারপিট দেখছিল।

এখানেই প্রশ্ন ব্যক্তিকে ও ব্যবস্থাকে। দুজনদের যৌথ নিষ্ক্রিয়তা ভয়ানক এই ডিস্টপিয়া তৈরি করে চলেছে।

Minimum Wages Act ঘরের কাজের মেয়েদের জন্য আজও প্রযোজ্য নয়। কারণ, তারা অসংগঠিত। বাইরের জগতে Female Work Participation Rate ক্রমাগত বাড়ার কারণে বাড়ির মেয়ে বউ মায়েদের দ্বারা "কাজের মেয়ের কাজ" সম্পন্ন হওয়াও কঠিন এখন। বাড়ির কাজটা যে এখনও বিশেষ ভাবে মেয়েদের, সে তো সমাজ গ্রাহ্য প্রিয়কথা। পুরুষ ঘরের কাজে হাত লাগালে আজও সে মহান। নিদেনপক্ষে প্রগতিশীল। কিন্তু একেবারে স্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে বাইরের জগতে কাজ না করেও শুধু ঘরের কাজ সামলানোটাও কিন্তু অসম্ভব বলেই মনে করা হয়। মূল কারণ, অল্প টাকায় শ্রম কেনা আমাদের গৃহ সংস্কৃতি।
আর এই অল্প টাকার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সেই মেয়েটির জন্য আলাদা খাওয়ার বাসন, চায়ের কাপ, খেতে বসার আলাদা জায়গা। তাবড় তাবড় বিপ্লব মনস্ক, বই মনস্ক মানুষের ঘরে এই ছবির বিকল্প দেখা যাবে না। অর্থাৎ কাজের মেয়ে কাজের জন্য বাড়িতে আবশ্যিক হলেও সে কিন্তু প্রথম থেকেই সন্দিগ্ধ চোখে দেখা একটি মানুষ। তার বাসন আলাদা না থাকলে রোগ সংক্রমণের শ্রেণীগত ভয় রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বাঁধার জন্য করোনা ভাইরাসের প্রয়োজন পড়ে না। সেই ভাইরাস আমাদের শ্রেণী অবস্থানকে নির্দিষ্ট করে।

আমাদের পিছিয়ে পড়া আর্থ- সামাজিকতা, আমাদের পিছিয়ে পড়া শিক্ষা ব্যবস্থা, আমাদের সমাজের ক্রমবর্ধমান আর্থিক অসাম্যর সঙ্গে কায়মনোবাক্যে সম্পৃক্ত আমরা। কবে বুঝতে পারব ঘরের কাজের মেয়েরা চাকরি করতে আসে বলে first generation learner তৈরি হয় ? আর চাকর কিন্তু আমরা সকলেই যারা চাকরি করি। Cliche শোনালেও কথাটি অকাট্য। তাই খেয়াল খুশি মতো নিজের ঠুনকো ক্ষমতা অপব্যবহারের ক্ষেত্র ঘরের কাজের মেয়েরা নয়। এই মেয়েরা যে যেখানে যেটুকু উপার্জন করে, তাদের প্রত্যেকেরই অন্তত দ্বিগুণ প্রাপ্য।

Society Language and Culture

আইনি সমর্থনসম্ভব একটি ব্যবস্থা এই মেয়েদের অবশ্য প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন বিশাল সংখ্যক অসংগঠিত ক্ষেত্রের সব কর্মীর। কেউ কেউ মনে করছেন অতি নিম্নবিত্ত মানুষ নানারকম সুবিধা ভোগ করছে কিছু ভাতা, কিছু ডোলের মাধ্যমে। তাদের বিনা খরচে চিকিৎসার সুযোগের কথাও ওঠে। সরকারি হাসপাতালে শুধু একটা এক্স রে করানোর জন্য পাঁচ ছ ঘন্টা লাইনে টানা দাঁড়াতে হয়, সে কথা জানি কি । এই অমানবিকতা বিলি করা হয় বিনা খরচে চিকিৎসার নামে।

লকডাউনের মধ্যেই হঠাৎ করে রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজন হাসিল করতে খুলে দেয়া হল মদের দোকান। মদের লাইনে ভিড় উপচে পড়ল নানা রকম পুরুষের। সেই ভিড় সামলানোর জন্য কোথায় পুলিশ, কোথায় শারীরিক দূরত্ব। এই অনিশ্চিত সময়ে অনটনের সংসারে ঘরে বসা পানাসক্ত পুরুষ যে তার পৌরুষ প্রদর্শনের ক্ষেত্র হিসেবে নিজের ঘরের সহজলভ্য মেয়ে বউকেই বেছে নেয়, তা আমাদের জানা তথ্য। এই হল পরোক্ষে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন প্রাপ্ত নারী-নিপীড়ন।

কর্পোরেট অফিসে লকডাউনের মধ্যে ছাঁটাই দ্রুত বাড়ছে সে কথা জেনেই বলছি, ওই ছাঁটাই হয়ে যাওয়া উচ্চপদের বা মাঝারি পদের কর্মী বলো আর ঘরের কাজের মেয়ে বলো, ভোটের অধিকার কিন্তু সকলেরই আছে।

যাদের ভোট দেয়া হয়, যারা সরকার গড়ে, প্রতিটি ভোটদাতার গণতান্ত্রিক অধিকার স্বরূপ তার কাজের নিরাপত্তা দেখার কোনও দায়িত্ব সরকারের নয় ?! তবে শুধু সরকারি কর্মীরা ভোট দিলেই ল্যাটা চুকে যায়। প্রশাসনকে কিছুই স্পর্শ করে না বলেই কি আমাদের স্পর্শকাতরতায় এতখানি ভাঁটার টান ? এক চিলতে বাঁচতে না পারলে কীসের প্রজাতন্ত্র, কীসের সাংবিধানিক অধিকার, কীসের স্বাধীনতা। দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে, তবু সংগঠিত হতে পারিনি মানুষের পতাকা ধরে। প্রতিবাদী সংগঠনগুলোও তো আজ একদম অসহায় রাষ্ট্রীয় ধৃষ্টতার সামনে। একদিকে রোজগারে টান বা রোজগার বন্ধ, পাশাপাশি মদের খোলা দোকান, আর অনলাইনে পড়াশোনা ঠিকমতো করে উঠতে না পারা সন্তানের আক্ষেপ, পড়াশোনায় বেড়ে চলা অনাগ্রহ , ড্রপ আউট হওয়ার আশঙ্কা -- সবটা মিলিয়ে একটু একটু করে ওদের শ্রম দিয়ে খুলতে চাওয়া আকাশ দেখার জানলাটা যেন আবার বন্ধ হয়ে আসছে।

করোনা নামক বিশ্বজোড়া অতিমারী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চলেছে সেই অতিমারীর আড়ালে ঘটে চলা shadow pandemic --- দারিদ্র্য ও লিঙ্গ- অবস্থানের কারণে

Society Language and Culture

ধারাবাহিক একপেশে দৃশ্য বা আপাত অদৃশ্য নারী নিপীড়ন। বাংলা তর্জমা করতে চেয়ে মনে হল যুৎসই হচ্ছে না। তাই জোরালো ইংরেজি শব্দ দুটোই রেখে দিলাম এই দরিদ্র পরিশ্রমী মেয়েদের জন্য --- shadow pandemic.

Society Language and Culture